বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গল্প

শুভ নববর্ষ। ২০২০ সালটি কী করে গেল ভাবতে অবাক লাগে। শুরু যখন হয়েছিল তখন ছিল কভিডের কড়া নাড়ানোর শব্দ। কেউ ভাবেনি তা সবাইকে আঘাত হানবে। কেউ ভাবেনি তা সার্স ভাইরাস সীমান্ত পেরিয়ে পৃথিবীর সবাইকে আঘাত করবে। অনেকটা দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার 'ঘরোয়া' ব্যাপার বলে সবাই চুপ করে ছিলাম। তবে গোটা ২০২০ সালে কভিড নিয়ে আমাদের গল্প কেবলই বদলেছে। কখনো মনে হয়েছে রোদ আসলেই বা শীত গেলেই তা চলে যাবে। কখনো মনে হয়েছে শীতের দেশের রোগবালাই আমাদের দেশে হবে না। কখনো মনে হয়েছে একবার হলে আর হবে না। কখনো মনে হয়েছে রোগটি বয়স্কদের জন্য বিপজ্জনক, বাকিদের জন্য সর্দি-কাশিজাতীয়। আমাদের ভাবনা কিংবা আশার শেষ নেই। প্রতিবারই আমাদের আশা-ভরসার সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে আমাদের চিন্তা কিংবা বলতে পারেন আমাদের প্রচেষ্টা। এখন মনে হচ্ছে টিকা দিয়েই তা মুক্ত হবে। কী হবে শেষ পর্যন্ত? তারই গল্প নিয়ে আমরা শেষ করেছি ২০২০ সাল।

আমরা সবাই জানি করোনার উৎপত্তিস্থল চীনের উহান। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ১ অক্টোবর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যে ১৫ জন সৌদি আরবে মার্স-কভ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তার মধ্যে ছয়জন মারা যায়। এই মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় মে ২০১৯ সালে। তবে তখনো তাকে মার্স রোগের একটি ধারা বলে মনে করা হয়েছে। ফলে তার নামের সঙ্গে মার্স শব্দটি লাগানো ছিল। মৃত্যুর খবর এসেছিল সৌদি আরব ও কাতার থেকে। ৬ নভেম্বর প্রথম এটিকে সার্স-কভ২ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিপোর্ট করে এবং প্রথম রিপোর্টটি আসে ডেনমার্ক থেকে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ডেনমার্কে ২০১৯ সালের জুনে প্রায় ২১৪ জন আক্রান্ত হয়। তবে ৫ নভেম্বর তারা ১২ জন রোগীর শরীরে প্রথম একটি পৃথক ভাইরাস দেখতে পায়। এদের আটজনকে সে দেশের উত্তর জুটল্যান্ড এলাকায় মিংক (বেজি-জাতীয় প্রাণী) ফার্মের কর্মী ও চারজন স্থানীয় অধিবাসী। তাদের বয়স ৭ থেকে ৭৯ বছর। এরপর ৩ ডিসেম্বর ও ২১ ডিসেম্বরে সার্স-কভ২ রোগীর খবর আসে ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্য থেকে। তবে গত বছরের ২০ জানুয়ারি থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথকভাবে কভিড রিপোর্ট দিতে শুরু করে।

প্রথম রিপোর্টটি ছিল এ রকম। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উহান শাখা প্রথমে 'বিশেষ নিউমোনিয়ার' ৪৪ জন রোগীর সংবাদ পাঠায়। তারা তাকে 'বিশেষ ধরনের নিউমোনিয়া' বলে আখ্যায়িত করে। কারণ তার কোনো কারণ তারা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এ রিপোর্ট চীন সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই পায়। এর কয়েক দিন পর ৭ জানুয়ারি চীনা কর্তৃপক্ষ এটিকে একটি নতুন ধরনের করোনাভাইরাস বলে বর্ণনা করে। ১১ ও ১২ জানুয়ারি চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ আরেকটি রিপোর্টে জানায় যে উহানের সামুদ্রিক মাছের বাজারের সঙ্গে এর একটি সংযোগ তারা পেয়েছে। একই সঙ্গে ১২ জানুয়ারি চীনা কর্তৃপক্ষ নতুন ভাইরাসের জেনেটিক সিকোয়েন্সটি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাছে পাঠায়, যাতে অন্যরাও এই প্রক্রিয়ায় ভাইরাসটি পৃথক করতে পারে। ১৩ জানুয়ারি থাইল্যান্ড প্রথম নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করে। ১৫ জানুয়ারি জাপান এবং ২০ জানুয়ারি কোরিয়াও তাদের দেশে রোগীর সংবাদ জানায়। ২৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রোগী শনাক্ত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একই রিপোর্ট প্রথমবার জানায় যে ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষেও সংক্রমিত হচ্ছে। এরপর রোগীর সংখ্যা গুণিতক হারে বাড়তে থাকে।

২৪ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা পৃথিবীতে বিমান চলাচলে সতর্কবার্তা পাঠায়। একই সময়ে সিঙ্গাপুরে প্রথম রোগীর সন্ধান মেলে। ২৫ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সব দেশকে কভিড সতর্কবার্তা পাঠায় এবং জানিয়ে দেয় কী করে রোগটির মোকাবেলা করা যায়। সঙ্গে পাঠায় নিরীক্ষার নিয়ম, পরিচর্যার গাইড বা উপদেশ ইত্যাদি। একই সঙ্গে সংস্থাটি তাদের গবেষণা দলকে রোগ মোকাবেলার জন্য সঠিক টিকা, ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার নিয়ম বের করার ব্যবস্থা দেখতে বলে। তবে দেখা যায় চীন তার ২৫টি বিমানবন্দরে ১২ জানুয়ারিতেই বিশেষ তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র বসিয়ে দেয়, যাতে প্রতিটি যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়। ২৫ জানুয়ারি চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের বসন্ত উৎসবের প্রাক্কালে সারা দেশে বড় ধরনের জনসমাগম স্থল বন্ধ করে দেয়। ২৬ জানুয়ারি মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সে রোগী পাওয়া যায়।

২৭ জানুয়ারি বিশ্ব সাহায্য সংস্থা ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম মহামারী মোকাবেলার জন্য বাজার ব্যবস্থায় সাপ্লাই চেইন অ্যালার্ট দেয়। কারণ মহামারীতে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সুরক্ষা সামগ্রীর বাজার তথা যাচাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই তারা পিপিইসহ সব পণ্যের রিপোর্ট তৈরির পরামর্শ দেয়। একই দিনে কানাডা, জার্মানি ও আমিরাতে রোগী দেখা দেয়। ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, ভাইরাসটির মূল উৎপত্তিস্থল উহান থেকে তা এখন গোটা চীনে বিস্তৃত হয়েছে। তবে তখন পর্যন্ত মোট রোগীর সিংহভাগই চীনে। প্রায় ১৫ হাজার রোগীর মধ্যে ১৩ হাজারের বেশি রোগীই চীনের উহানে। ১৯ ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কী করে রোগীর পরিচর্যা, ইনটেনসিভ কেয়ার ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা যায়, তা শেখানোর জন্য অনলাইন কোর্স চালু করে। তবে ততদিনে ৭৫ হাজারেরও বেশি লোক বিশ্বে আক্রান্ত।

এদিকে পিপিই-সংক্রান্ত বাজার যাচাই রিপোর্টের ভিত্তিতে ২৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পিপিই ব্যবহারে সতর্কতার পরামর্শ দেয় এবং জানায় যে জরুরি স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য তা একটি অতি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা, তাই তারা অন্যদের তা ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করে। ৮ মার্চের মধ্যে রোগটি পৃথিবীর ১০০টি দেশে ছড়িয়ে যায়। ১২ মার্চ সংস্থাটি কভিডকে একটি বিশ্ব মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেয়।

ওইদিন আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার সঙ্গে যৌথ এক বিবৃতিতে কভিড মোকাবেলায় বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশে প্রথম তিনজন শনাক্ত হয় ১১ মার্চ। আর যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তাদের প্রথম রোগীর রিপোর্টটি করে মার্চের ৭ তারিখে। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী সে দেশে প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ২৩ জানুয়ারি।

এবার আসুন টিকাসংক্রান্ত তথ্য দেখি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গত ২৯ ডিসেম্বরের তথ্য অনুযায়ী এ-যাবৎ ১৭২টি টিকা নিয়ে গবেষণা চলছে, যার মধ্যে ৬০টি টিকা নিয়ে গবেষণা এখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পর্যায়ে। তবে এসব গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু মূলত চীন, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র। চীন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ করেছে ৩৮টি, যুক্তরাষ্ট্র ২৫টি। এগুলোর মধ্যে ১৩৮টি গবেষণা নিয়ন্ত্রিত দৈব নমুনা চয়ন (আরসিটি) পদ্ধতিতে এবং ৩০টি দৈবচয়নহীন নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় নমুনা নিয়ে ক্লিনিক্যাল গবেষণা করেছে চীনা সিনোভ্যাক ও অক্সফোর্ড টিকা। তাদের নমুনা সংখ্যা যথাক্রমে ১৩ ও ১২ হাজার। সিনোভ্যাকের ট্রায়ালের ফলাফল পাওয়া যাবে ২০২১ সালের অক্টোবরে আর অক্সফোর্ডের ট্রায়াল শেষ হবে তাদের তথ্যমতে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর। আর গবেষণার ফলাফল পাওয়া যাবে ২০২২ সালের জুলাইয়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের টিকাগুলোর গবেষণার নমুনার সংখ্যা অধিকাংশই ১০০-২০০ জনের মধ্যে। তবে কোনো কোনোটিতে নমুনা সংখ্যা দুই হাজারের একটু ওপরে। তৃতীয় স্তরের গবেষণায় টিকা দেয়ার পর এক বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয় নানা উপসর্গ নিয়ে। তবে তিন স্তরের গবেষণায় টিকা গ্রহণের এক বছর পর্যন্ত সময়ে নানা উপসর্গ নিয়ে গবেষণা করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে কেবল সুস্থ দেহে টিকা দিয়ে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। অতএব, রোগ নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় স্তরের গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, তবে এতগুলো টিকার নাম শুনছি কেন? যে ৬০টি টিকা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে, তার মধ্যে ১৩টি এখন তৃতীয় স্তরের ট্রায়ালে এবং দুটি দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরের গবেষণায় রয়েছে। যার ছয়টি চীনের তৈরি, যুক্তরাষ্ট্রের চারটি, কানাডা, রাশিয়া, জার্মানি, বেলজিয়াম ও যুক্তরাজ্যের একটি করে টিকা। গবেষণায় সর্বাগ্রে রয়েছে দুটো—সিনোভ্যাক ও অ্যাস্ট্রাজেনেকা (অক্সফোর্ড), যাদের ট্রায়াল অনেক বড় ও ব্যাপক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, যে পাঁচটি টিকা তাদের ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাদের তিনটি অর্থাৎ মডার্না, অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও ফাইজার তাদের গবেষণার ফল কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছে, কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তা প্রকাশিত হয়নি। অতএব, বুঝতেই পারছেন টিকা নিয়ে আমাদের টনক নড়ানো উচিত। অ্যাস্ট্রাজেনেকার (অক্সফোর্ড) একটি গবেষণাসহ এ-যাবৎ যে ১০টি গবেষণাপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, এর সব কয়টির দ্বিতীয় স্তরের নমুনা নেয়া হয়েছে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের ওপর। মনে রাখা উচিত দ্বিতীয় স্তরের টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে কেবল সুস্থ মানুষের ওপর, তবে তা গ্রহণের ফলে গ্রহণকারীর স্বাস্থ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি। আমাদের মধ্যে যারা নানা রোগে ভুগছে, তাদের কারো ওপর দ্বিতীয় স্তরের গবেষণায় কোনো নমুনা পরীক্ষা করা হয়নি। এটা কেবল তৃতীয় স্তরের গবেষণায় প্রযোজ্য হয়। ৬০টির মধ্যে ১০টির ডোজ একবার, ৩৭টির দুবার, একটির তিনবার আর বাকি ১২টির তথ্য নেই। এর মধ্যে তিনটি মুখে খাবার টিকা, ৫১টি ইনজেকশন দিয়ে দেয়ার টিকা আর ছয়টির কোনো তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় নেই।

এই যখন অবস্থা তখন কয়েকটি সংবাদ দিই। আমার এক সহকর্মী ফোনে জানালেন যে দেশের একটি টেলিকম কোম্পানি নাকি টিকার টাকা অগ্রিম দিয়ে দিয়েছে। তারা নাকি তাদের কর্মীদের পরিবারের জন্যও তা দেয়ার ব্যবস্থা করবে! আল্লেল গুড়ুম আমার। যেসব কোম্পানি শতকোটি টাকার কর ফাঁকি দেয়, তাদের এই অবস্থান আমার কল্পনাশক্তিকে হার মানায়। আরেক সহকর্মী বললেন যে তার পরিচিত এক কোম্পানি নাকি তার কর্মীদের জন্য একই ব্যবস্থা করেছে। আমার ধারণার অতীত এমন কার্যক্রম। এরা সবাই কর ফাঁকিবাজদের দলে, অথচ তারাই নাকি তাদের কর্মীদের সহায়তার জন্য গোপনে এসব ব্যবস্থা সেরে রেখেছে এবং অতি গোপনে তার প্রচারণা চালাচ্ছে। অনেকটা সরকারকে বোকা বানানোর গল্প বা টাকা পাঠানোর আরেক কারসাজি। মনে করুন সরকার ব্যর্থ হলো টিকা আনতে আর এসব কোম্পানি তাদের কর্মীদের টিকা দিয়েছে—অবস্থাটা কেমন হবে? সরকার ২৪ ঘণ্টাও টিকে থাকতে পারবে কি? তাও আবার সেই টিকার জন্য আগাম টাকা দিয়েছে, যার ট্রায়াল এখনো শেষ হয়নি!

টিকার কার্যকারিতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পর্যালোচনাটাও বলে রাখি। তাদের গবেষকদের মতে, টিকার কার্যকারিতা নির্ভর করবে কত তাড়াতাড়ি তা জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় তার ওপর। তবে তা কখনই ১০০ শতাংশ কার্যকর হবে না। যা অন্য সব টিকার ক্ষেত্রেও হয়নি। শুধু তাই নয়, টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হলো, তা চালু হলে শুরু করতে হবে সবচেয়ে সংবেদনশীলদের মধ্যে। যাদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী, বয়স্ক মানুষ প্রমুখ।

সব মিলিয়ে যে চিত্র উঠে আসে তা হলো, আমাদের করোনা পরিস্থিতির দ্রুত কোনো উন্নতি আশা করা বৃথা। তাই আমাদের সাবধানে পার করতে হবে ২০২১ সাল। আমাদের মনে রাখতে হবে কভিডের মতো মহামারী পরিস্থিতি বিশ্ব শত বছর পর নতুন করে দেখছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য এটি প্রথম অভিজ্ঞতা। গত ১০০ বছরে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধি সংক্রমিত হওয়ার সূত্র এখন অনেক। ১০০ বছর আগে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এত দ্রুত যোগাযোগ ছিল না। তাই নিয়ন্ত্রণ ছিল সহজ। আজ আর তা নয়। তাই সহজে তার সমাধান হবে না। তাই বলে আমাদের বোকার মতন বসে থাকলেও চলবে না। পরে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। আমাদের পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবর্তন হতে হবে আমাদের চলাফেরায়, ভাবনা-চিন্তায়।

২০২১ সাল হবে পরিবর্তনের বছর। এ সময় আমাদের তৈরি হতে হবে কভিড-পরবর্তীর নতুন পৃথিবীর উপযোগী নতুন নিয়ম নিয়ে। আমার ছেলের পরিচিত এক বন্ধু চাকরি করত চীনা একটি কোম্পানির সিঙ্গাপুর শাখায়। কভিডের জন্য বহুদিন তারা বাসায় বসে চাকরি করত। দেখা গেল তাতে কোম্পানির টাকা বেঁচে যায়। তারা তাই তাদের বেতন বাড়িয়ে দেয়। যাতে বাড়িতে তারা আরামদায়ক অবস্থায় থেকে কাজ করতে পারে। কয়েক দিন হলো তারা জানিয়েছে, তোমাকে যে সিঙ্গাপুরে থেকে কাজ করতে হবে তাও নয়। চলে যেতে পারো নিজে দেশে। সেখান থেকেই কাজ করো। সে চলে এসেছে দেশে। বুঝতেই পারছেন কাজের স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক পরিবর্তন আসবে। যেসব কাজে ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যিক, তা ছাড়া বাকি প্রায় সব কাজই এখন থেকে হবে অনলাইনে। তাই প্রয়োজন হবে ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি। ৫জি গতির কথা এখনই চিন্তা করতে হবে। তাতে সংক্রমণ হ্রাস পাবে। বহু কার্যক্রম চলে যাবে অনলাইনে। শুধু তাই নয়, চাপ কমবে ঢাকার জনঘনত্বে। শুধু তাই নয়, আপনি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে আপনার সন্তানকে বাংলা শেখাতে পারবেন। চালু করুন অনলাইন স্কুল। সবকিছু সরকারকে করতে হবে না। সরকারকে চালু করতে হবে নতুন নিয়ম। আপনার সন্তানকে বাড়ি থেকেই ভর্তি করে দিন সেরা শিক্ষকের কাছে। চিকিৎসায়ও পরিবর্তন আসবে। সবই চিন্তা করতে হবে ২০২১ সালে। আশা করি পরিবর্তন আসবে।

আমাদের করোনা পরিস্থিতির দ্রুত কোনো উন্নতি আশা করা বৃথা। তাই আমাদের সাবধানে পার করতে হবে ২০২১ সাল। আমাদের মনে রাখতে হবে কভিডের মতো মহামারী পরিস্থিতি বিশ্ব শত বছর পর নতুন করে দেখছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য এটি প্রথম অভিজ্ঞতা। গত ১০০ বছরে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধি সংক্রমিত হওয়ার সূত্র এখন অনেক। ১০০ বছর আগে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এত দ্রুত যোগাযোগ ছিল না। তাই নিয়ন্ত্রণ ছিল সহজ। আজ আর তা নয়। তাই সহজে তার সমাধান হবে না

ড. এ. কে. এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট